Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 15-22
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অর্থববেদের আলোকে কৃষিকার্যের মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ:

প্রসেনজিৎ পটুয়া
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Since ancient time the Indians were aware of the importance of agricultural land on account of being a land of agriculture. Land is the main factor of agriculture. The production of nutritious food is prerequisite for having a longer nourishing life span of humans. In spite of the higher agricultural production unleashed by the green Revolution in modern age, the quality of nutrition in agricultural productions has decreased enormously. As a result, human health is deteriorating daily. At present, chemical fertilizers and insecticides are being used indiscriminately by modern agriculture science. Thus the agricultural production diverted of proper nutrition is increasing. Hence, such life threatening problems engendered by modern agriculture may appear as one of the deadly causes for the depletion or destruction of human cultures. On the other hand, many evil consequences are coming into being through the inordinate proliferation of such modern technological and scientific advancements in agriculture.

In Vedic texts we encounter the instances of agricultural experts and researchers for the solution of various agricultural conflicts. One of the vital natural elements or ingredients for agriculture is water. As it is unthinkable for agriculture without land, so it utterly impossible to carry out cultivation without water. In Vedic texts, water has been addressed as apo, salil, bristi etc. In Vedic age, the importance of water was immense. The know-how of agriculture was lifeline of the Vedic culture. The problems of present agriculture extensively pointed out by the agricultural scientists can be sorted out with the agricultural methods of the Vedic time. Therefore, the scientific method is always the reflection of a profound knowledge. We can mend our mandates of present agricultural problems along with the implementation of the future agricultural policies by means of critical outlook and appraisal of the agricultural mechanisms and mandates prevalent in ancient and Vedic eras.

Keynote Address: Indians, Agriculture, Green revolution, human culture, Vedic Texts, Water etc.

মানবজীবনে দীর্ঘ আয়ুর জন্য প্রয়োজন পুষ্টিগুণযুক্ত আহার। বর্তমানযুগে কৃষিকার্যে সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষির উৎপাদন মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলেও, কিন্তু কৃষিজ দ্রব্যের গুণগতমান অর্থাৎ পুষ্টিগতগুণ হ্রাস পেয়েছে। এরজন্য ক্রমাগত স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। বর্তমানে প্রগতিশীল কৃষিতে প্রচুরমাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার

করা হচ্ছে। তারফলে উৎপন্ন হচ্ছে পুষ্টিগুণহীন কৃষিজাত দ্রব্য। সুতরাং প্রগতিশীল কৃষিতে এইভাবে উদ্ভব হওয়া সমস্যাগুলি ভবিষ্যতে মানব সংস্কৃতির বিনাশের অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই প্রগতিশীল কৃষির মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার কাছে অন্যদিকে চলে আসছে অনেক দুষ্পরিণতি।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধানদেশ হওয়ার জন্য প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবাসী ভূমির গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত ছিল। ভূমিই কৃষির প্রধান উপাদান। এই কারণেই যজুর্বেদে উল্লিখিত হয়েছে- "ভূমিরাবপনং মহৎ"।[1] অর্থাৎ কৃষির মহান স্থান ভূমিই. যজুর্বেদে ভূমির প্রশংসা করা হযেছে- "নমো মাত্রে পৃথিব্যৈ নমো মাত্রে পৃথিব্যা.....কৃষ্যৈ ত্বা ক্ষেমায ত্বা রয্যৈ ত্বা পোষায ত্বা"।[2] অর্থববেদেও ভূমির গুরুত্ব ব্যক্ত হয়েছে। এই অর্থববেদের পৃথিবীসূক্ত বা ভূমিসূক্তিই ভূমির মহত্ব বিচারকারী প্রথম উদাহরণ, যেখানে ঋষি নিজেকে পৃথিবীর বা ভূমির পুত্র এবং পৃথিবীকে মাতারূপে সম্বোধন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः"।[3] আবার অর্থববেদে পৃথিবীকে জননীরূপে স্বীকার করা হয়েছে- "विद्यो ष्वस्य मातरं पूथिवीं भूरि-वर्पसम्... "।[4] ভূমির অধিকার সর্বদা কৃষির অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

কৃষিজমির অধিকার, বিভাজন এবং পরিমাপ: অতি প্রাচীনকালে ভূমির উপর জনসমুদায়ের অধিকার থাকতে পারে এবং সেই ভূমি থেকে উতপাদিত ফসল পরস্পর সামুদায়িকতার উপর নির্ভর করে বিতরণ করা হয়ে থাকতে পারে। অন্য রাজ্যের ভূমির সুরক্ষা প্রদান করার জন্য উৎপাদিত ফসলের উপর কর গ্রহণ করার অধিকার ছিল। এর ফলে ভূমির উপর রাজার অধিকারের সার্বভৌমিকতার মান্যতা জন্ম দিয়েছিল। রাজা নিজের ইচ্ছা অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মন্দির এবং বিহারে ভূমি দান করতেন। এইরূপ ভূমিদানই তার ভূ-স্বামিত্বকে ব্যক্ত করে. পরবর্তীকালে পারিবারিক বিভাজনের ফলে ভূমির ব্যাক্তিগত ভূ-স্বামীত্বের জন্ম হয়। এইভাবে প্রাচীন ভারতে ভূ-স্বামীত্বের সম্পর্কে তিনটি ধারণা প্রচলিত হয়—

১। সামুহিক ভূস্বামিত্ব
২। ব্যাক্তিগত ভুস্বামিত্ব
৩। রাজ্যের বা রাজার ভুস্বামিত্ব

বাস্তবে প্রাচীন ভারতে ভূমির উপর কার অধিকার ছিল? এই সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, কেননা এই তিনটি ভুস্বামিত্বের পক্ষে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। এই জন্যই ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়।

ভূমির অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য এবং পরম্পরাগত প্রাচীনতম উল্লেখ বৈদিক সাহিত্য থেকে পাওয়া গেলেও কিন্তু এই সম্পর্কিত নিয়ম কিন্তু সর্বপ্রথম ধর্মসূত্র গুলি থেকেই পাওয়া যায়, যা পরবর্তীকালে স্মৃতিকারগণ, টীকাকারগণ এবং লেখকগণ নিয়মগুলিকে সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত করেছিলেন। রাজ্য বা রাজার উৎপত্তির পূর্বেই প্রকৃতি দ্বারা প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপর সমগ্র জনসমাজের অধিকার ছিল। তারা প্রকৃতি প্রদত্ত নদী, ঝর্ণা, পুকুর, বন-জঙ্গল, ভূমি, পর্বত, রাস্তা-ঘাট এবং গো-চারণভূমি ইত্যাদি সকল বস্তু সমান ভাবে উপভোগ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে ব্যক্তিগত মানিকানা প্রতিষ্ঠত পায়। শতপথ ব্রাহ্মণে[5] বলা হয়েছে যে -প্রতিবেশীদের অনুমতি ছাড়া কোনো রাজা ভূমি দান করতে পারেন না। ধর্মসূত্র ও অর্থশাস্ত্রে গো-চারণ ভূমিকে সকল গ্রামবাসীদের

[1] শুক্লযজুর্বেদ-২৩.৪৬
[2] শুক্লযজুর্বেদ-৯.২
[3] অথর্ববেদ-১২.১.১২
[4] অথর্ববেদ-১.২.১
[5] শতপথ ব্রাহ্মণ-৭.১.১.৪

উপযোগের বস্তু বলে স্বীকার করা হয়েছে। ঋগ্বেদে মন্ত্রে[1] গ্রামের সকল পশুদের একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিপালন এবং সেই সঙ্গে গো-চারণ ভূমিতে চরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কৃষিকার্যের দৃষ্টিতে ভূমির যথাযথ বিভাজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বেদে ভূমিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- ১. কৃষ্টপচ্যা ২. অকৃষ্টপচ্যা। যর্জুবেদে কৃষিকার্য দ্বারা উৎপাদিত পরিপক্ক অন্নকে কৃষ্টপচ্যা এবং কৃষিকার্য ছাড়া উৎপাদিত পরিপক্ক অন্নকে অকৃষ্টপচ্যা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কথিত হয়েছে-

"কৃষ্টপচ্যাশ্চ মেহকৃষ্টপচ্যাশ্চ মে..... "[2]

ঋগ্বেদে[3] ভূমিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. আর্তনা ২. অপ্লস্বতী ৩. উর্বরা বা ক্ষেত্র।

অন্যদিকে যজুর্বেদে ভূমির উপর অবস্থিত পাহাড়- পর্বত, মৃত্তিকা, বালি, পাথর, বনস্পতি ইত্যাদিকে আধার করে ভূমির বর্ণনা করা হয়েছে।

মহর্ষি বাল্মীকি ব্যবহারিক দৃষ্টির দিক থেকে ভূমিকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন-

১.নিবাস ভূমি- নগর, গ্রাম ইত্যাদি
২.কৃষি ভূমি- চাষযোগ্য ক্ষেত্র বা জমি
৩.গোচর ভূমি- গো-চরণ ভূমি
৪.বন প্রদেশ- কানন

বৈদিক গ্রন্থগুলিতে ভূমি বিবাদ এবং তার সমাধানের জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে কৃষি বিশেষজ্ঞকে বলা হয়েছে 'ক্ষেত্রবিৎ'। তিনি জমির মাপ-জোপ করতেন। যে ব্যাক্তি এই বিদ্যা জানতেন না তাকে বলা হত 'অক্ষেত্রবিৎ'। সুতরাং ঋগ্বৈদিক যুগে জমির মাপ-জোপ করা হত। জমিকে মাপ-জোপ করে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করা হত এবং কৃষক কৃষিকার্যে তা ব্যবহার করতেন। ফিতে দড়ি বা মাপদণ্ড দ্বারা জমি মাপ করা হত। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে- "क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेनं.... "[4] কিন্তু তৎকালীন সময়ে জমি পরিমাপের একক কী ছিল তা জানা যায় না। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম সন্দর্ভ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, ধর্মসূত্র এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়।

জলসেচনঃ নিয়ম ও ব্যবহার: কৃষিকার্যের প্রধান প্রাকৃতিক তত্ত্ব গুলির মধ্যে জলের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন ভূমি ছাড়া কৃষিকার্যের কল্পনা করা যায় না তেমনি জল ছাড়া কৃষিকার্য সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব পরিকল্পনা। বৈদিক সাহিত্যে জলকে অপ, সলিল, বৃষ্টি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৈদিকযুগে জলের গুরূত্ব অপরিসীম ছিল। তা যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়েছে-

"सं मा सृजामि पयसा पृथिव्याः सं मा सृजाम्यद्भिरोषधीभिः।सोऽहं वाजम् सनेयमग्ने" [5]

আবার ঋগ্বেদে ঋষি জলদেবীর নিকট নিজেদের রক্ষা করার প্রার্থনা করেছেন- "आपोदेवीरिहमामवन्त्त"।[6]

---

[1] ঋগ্বেদ-১০.১৯.৩-৪
[2] শুক্লযজুর্বেদ-১৮.১৪
[3] ঋগ্বেদ-১.১২৭.৬
[4] ঋগ্বেদ-১.১১০.৫
[5] শুক্লযজুর্বেদ-১৮.৩৫
[6] ঋগ্বেদ-৭.৪৯.১-৪

বর্ষা ঋতুতেই মেঘ বর্ষণের ফলে অধিক জলের প্রাপ্তি হয়। এই জন্যই যর্জুবেদে জীবনদায়ী বর্ষা ঋতুকে ঋষি নমস্কার করেছেন- "নমো বঃ পিতরো জীবায়"।[1] প্রস্তুত মন্ত্রে সায়ণাচার্য "জীবায়" পদটির "জীবনহেতুভূতায় বর্ষাভ্যো"এই রূপ অর্থ করেছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং অর্থববেদে সেচন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত জলের বিভিন্ন প্রকার উৎস প্রসঙ্গে বর্ণনা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে সেচন ব্যবহৃত চার প্রকার জলের উল্লেখ পাওয়া যায়-

১.দিব্যাঃ আপঃ- মেঘ থেকে বৃষ্টির দ্বারা প্রাপ্ত জল।
২.খনিত্রিমা আপঃ- খননকার্যের দ্বারা নির্মিত কূপ এবং প্রাপ্ত ভৌমজল।
৩.স্বয়ংজা আপঃ- ঝর্ণা থেকে প্রাপ্ত জল।
৪.সমুদ্রার্থ আপঃ- সমুদ্রে মিলিত নদী থেকে প্রাপ্ত জল।

অথর্ববেদে তিনটি সূক্তে[2] কৃষিতে সেচনকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জলের উৎস বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

১. ধন্বন্যাঃ আপঃ- মরূপ্রদেশে প্রাপ্ত জল।
২.অনুপ্যা আপঃ- পুকুর, খাল-বিল ইত্যাদিতে প্রাপ্ত জল।
৩.খনিত্রিমা আপঃ- ভূ-গর্ভ খননের দ্বারা তৈরী কূপ এবং ইঁদারা থেকে প্রাপ্ত জল।
৪.কুম্ভে আভৃতাঃ- ঘড়া ভর্তি করে আনা জল।
৫.বার্ষিকীঃ আপঃ- বর্ষার দ্বারা প্রাপ্ত জল।
৬.সিন্ধুভ্যঃ- নদ-নদীর জল।
৭.হৈমবতী আপঃ- হিমাচ্ছাদিত পর্বত থেকে প্রাপ্ত জল।
৮.উৎস্যাঃ তে শং উ সন্ত- স্রোত থেকে প্রাপ্ত জল।
৯.সনিষ্যদা আপঃ- বেগের দ্বারা প্রবাহিত জল।

অতএব এই সকল প্রমাণের ভিত্তিতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন সময়ে বর্তমান সময়ের ন্যায় প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় প্রকার জলই কৃষিকার্যে ব্যবহার করা হত।

কৃষন্তঃ বা ভূমি কর্ষণবিধি: কৃষির সর্বপ্রথম বিধি বা ক্রিয়া হল ভূমির কর্ষণ। ভূমি কর্ষণ করেই ভূমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করে তোলা হয়। কর্ষণ ছাড়া ভূমিতে কৃষিকার্য করা প্রায় অসম্ভব। বৈদিক সাহিত্যে অনেক স্থানে ভূমি কর্ষণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই উপকরণ গুলির মধ্যে লাঙ্গল একটি প্রধান উপকরণ। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং অর্থববেদের অনেক মন্ত্রে লাঙ্গলের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বপন্তঃ বা শস্য বপনবিধি: কৃষিকার্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধি হল বপন বা রোপনবিধি। বৈদিক সাহিত্যে বপন বা রোপন পদের জন্য 'বপণ',[3] 'বপত',[4] 'বপন্ত'[5] ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করা হয়েছে। আবার যে বপণ করে তাকে 'বপ'[6] নামে অভিহিত করা হয়। যজুর্বেদে "কৃতে যোনৌ বপতেহ্ বীজম্" দ্বারা স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ভূমি

[1] শুক্লযজুর্বেদ-২.৩২
[2] অথর্ববেদ-১.৪.৫, ১৯.২.১-২,১.৬.৪
[3] ঋগ্বেদ-১.১১৭.২১
[4] অথর্ববেদ-৩.১৭.২
[5] শতপথ ব্রাহ্মণ-১.৬.১.৩
[6] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-৩.৪.৩.১

পরিস্কার করার পরই বীজ বপন করা উচিৎ[1] । অক্ষিত বীজ শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে ভালো প্রজাতি এবং পোকা মাকড় বিহীন বীজই বপন করা উচিৎ। অনুরুপ নির্দেশ অর্থববেদে[2] ও প্রাপ্ত হয়। গৃহ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্তাকে ক্ষেত্রে গিয়ে প্রাথমিক ক্রিয়া করার পর তৈত্তিরীয় সংহিতার নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করে বীজ বপন করা উচিৎ-

"যা জাতা ওষধয়ো দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা।
মন্দামি বভ্রূণামহং শতং ধামানি সপ্ত চ"।।[3]

ঋগ্বেদে[4] উল্লিখিত হয়েছে যে, অশ্বিনদেবতাদ্বয় মনুকে বীজ বপনের কলা শিখিয়ে ছিলেন।

লুনন্ত বা শস্য কর্ত্তনবিধি: ফসলের গাছ পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে এবং ফসল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পর কর্ত্তন বা কাটা হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে এই বিধিকে বোঝাতে লুনন্ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফসল কাটার সময় অনেক ধার্মিক অনুষ্ঠান করা হতো। বৈদিক যুগে কাটার জন্য মূখ্যসাধন ছিল কাস্তে বা হেঁসো। অথর্ববেদে[5] ফসল কাটার পূর্বে কৃষকের আনন্দের একটি প্রাণোচ্ছল বর্ণনা পাওয়া যায়। কাটা ফসল ছোটো ছোটো মুঠি করে বেঁধে খামারে নিয়ে যাওয়া হতো।[6]

মৃণন্ত বা শস্য ঝাড়ার পদ্ধতি: খামারে সংগৃহীত ফসলকে কাণ্ড থেকে আলাদা করার জন্য ঝাড়া হতো। শতপথ ব্রাহ্মণে[7] ঝাড়া শব্দের জন্য মৃণন্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্ভবত ফসলকে পাথরের উপর বার বার আঘাত করে ঝাড়া হতো। অথর্ববেদের একটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফসলকে উলূখলের মধ্যে রেখে মূসল দিয়ে কোটা হতো।[8] ফসল ঝাড়ার পর চালুনীতে চেলে অথবা শূর্প[9] দ্বারা উড়িয়ে ফসল থেকে ঘাস এবং ভূষি আলাদা করা হতো। যে এই কর্মটি করতো তাকে ধান্যকৃত বলা হতো।[10] এরপর কয়েকটি ধার্মিক অনুষ্ঠানের দ্বারা ফসলকে ঘরে নিয়ে এসে মাপ করে সুরক্ষিত স্থানে রেখে দেওয়া হতো। উর্দর নামক পাত্র দ্বারা মাপ করা হতো।[11] অন্নকে সুরক্ষিত রাখার জন্য অন্নাগার তৈরী করা হতো, ঋগ্বেদে[12] একে স্থিবি বলা হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে উর্বরকের ব্যবহার: কৃষির উপযোগী প্রধান দুটি প্রাকৃতিক তত্ত্ব ভূমি এবং জলের সম্বন্ধে আলোচনা করার পর অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করার জন্য জমিতে উর্বরক সার ব্যবহার করা হতো। প্রাণীদের মতো উদ্ভিদদেরও জল এবং খাদ্য প্রয়োজন হয়। যেমন জলের প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উৎস আছে সেরুপ খাদ্যেরও অর্থাৎ উর্বরকের প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উৎস আছে। উদ্ভিদদের জন্য যে খাদ্য প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায় তা প্রাকৃতিক উৎস,

---

1 বাজসনেয়ী সংহিতা-১২.৬৮
2 অথর্ববেদ-৩.১৭.৫,১০.৬.৩৩
3 তৈত্তিরীয় সংহিতা-৪.২.৬.১
4 ঋগ্বেদ-১.১১২.১৬
5 অথর্ববেদ-৩.১৭.৫
6 ঋগ্বেদ-১০.৮৪.৭, অথর্ববেদ-৮.৬.১৫
7 শতপথ ব্রাহ্মণ-১.৬.১.৩
8 অথর্ববেদ-৯.৬.১৪
9 অথর্ববেদ-৯.৬.১৬
10 ঋগ্বেদ-১০.৯৮.১৩
11 ঋগ্বেদ-২.১৪.১১
12 ঋগ্বেদ-১০.৬৮.৩

যেমন- সূর্যালোক, বায়ু, মাটির জৈব পদার্থ ইত্যাদি। মানুষের দ্বারা তৈরী যে খাদ্য তা কৃত্রিম উৎস, যেমন-বিভিন্ন প্রকার সার(রাসায়নিক এবং জৈব)। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সূর্যালোক এবং বায়ু কৃষির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যদি প্রয়োজনীয় সূর্যালোক না পাওয়া যায়, তাহলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যজুর্বেদে বলা হয়েছে যে, সূর্যের কিরণ বীজের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধির কারক- "तस्यां नो देवःसविता धर्म साविषत्"।[1] আবার অন্য মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, কৃষির কৃষির জন্য অগ্নির সহযোগিতা প্রাপ্ত হোক। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "विश्वे भवन्त्यग्नय समिद्धाः"।[2] সূর্যের কিরণ শুধুমাত্র উদ্ভিদের খাদ্য উপাদানই নয়, বরং কৃষির উপযোগী বৃষ্টিপাত ঘটাতে সাহায্য করে- "सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनये"।[3] প্রাচীনকালে মানবজাতি জৈবসার ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পদ্ধতি ভালোভাবেই জানতো। এর প্রাথমিক জ্ঞান বেদেই পাওয়া যায়, যেখানে গায়, বলদ এবং মহিষের গোবরকে সর্বাধিক উপযোগী বলে স্বীকার করা হয়েছে। ঋগ্বেদে উর্বরকের জন্য ক্ষেত্রসাধস শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে- "ते नोव्यन्त व्रार्य देवत्रा क्षेत्रसाधसः"।[4] 'ক্ষেত্রসাধস' শব্দের অর্থ হল-জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধিকারী পদার্থ। অথর্ববেদে পশুদের প্রাকৃতিক সারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- "करीषिणीम् फलवतीं स्वधाम..... "।[5]

যে কোন কার্যের সফলতা নির্ভর করে সেই কার্যে ব্যবহৃত উপকরণগুলির উপর। বেশী উপকরণের ব্যবহারে কার্যের গুণগতমান এবং গতি বৃদ্ধি পায়। তাই কৃষির মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যে বিভিন্ন উপকরণের প্রয়োগ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। বৈদিকযুগ থেকেই কৃষিকার্যে লাঙ্গল, ফাল, হেঁসো ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-

লাঙ্গল বা হল:- বেদে কৃষিকার্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে সর্বপ্রথম লাঙ্গলের বর্ণনা বিভিন্ন মন্ত্রে পাওয়া যায়। সাধারণত ভূমি কর্ষণই হল কৃষিকার্যের প্রথম পদক্ষেপ। বর্তমান কালের মত বৈদিক কালেও লাঙ্গল এবং বলদের সাহায্যে কর্ষণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হত। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে স্পষ্ট ভাষায় উক্ত হয়েছে-

"उतोसमह्यमिन्दुभिः षड़युक्ताँ अनुसेषित्।
गोभिर्यवंनकृषत्"।।[6]

সম্ভবত এই কারণেই কৃষিকার্যে লাঙ্গলের অনিবার্য প্রয়োজনীতা লক্ষ্য করে গৃহ্য-সূত্রগুলিতে গৃহ্য সম্পর্কিত সকল ধার্মিক সংস্কার এবং পূজা সম্পর্কিত কার্যে লাঙ্গলের কোনো না কোনো ভাগকে উঠানে প্রতিস্থাপন এবং পূজা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এই ভাবেই কৃষিকার্যের শুরুতে সমাজে ধীরে ধীরে লাঙ্গল পূজার বিধান প্রচলিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে লাঙ্গলের বিষয়ে অনেক তথ্য প্রাপ্ত হয়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"युनक्त सीरा वि युगा तनध्वं कृते योनौ वपतेह वीजम्।
गिरा च श्रुष्टिः सभ्यरा असन्नो नेदीय इत् सृण्यःपक्वमेयात्"।।[7]

---

1 বাজসনেয়ী সংহিতা-১৮.৩০
2 বাজসনেয়ী সংহিতা-১৮.৩১
3 বাজসনেয়ী সংহিতা-৩৮.৬
4 ঋগ্বেদ-৩.৮.৭
5 অথর্ববেদ-১৯.৩১.৩
6 ঋগ্বেদ-১.১৩.২৫
7 ঋগ্বেদ-১০.১০১.৩

এখানে 'সীরা' পদটি লাঙ্গল বা হল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'যুগা' পদটির অর্থ 'জোয়াল', যা লাঙ্গলের মুখ্য অঙ্গ। সুতরাং জোয়ালে বৃষ সংযোজন করে লাঙ্গল চালানোর কথা এই মন্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। এইরুপ অর্থ স্বয়ং সায়ণাচার্য করেছেন। সূক্তের অপর মন্ত্রে মেধাবীদের দ্বারা লাঙ্গল চালানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কথিত হয়েছে-

"सीरा युञ्जन्ति कवयः युगा वि तम्वते।
पृतक् धीराः देवेषु सुम्नया"।।[1]

আবার অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে পৃথু বৈন্য সর্ব প্রথম মনুষ্যগণের জন্য কৃষিকার্যের দ্বারা ফসল উৎপন্ন করেছিলেন-

"तां पृथी वैन्योअक्तां कृषिं च सस्यं चधोक्।
ते कृषिं च सस्यं च मनुष्या उप जीवन्ति कृष्टराधिरूपजीविनी"।।[2]

সম্পূর্ণ বৈদিক সাহিত্যে হল (লাঙ্গল) পদের জন্য পর্যায়বাচী শব্দ ব্যবহার করা হয়। যথা- ১. সীর ২. সীল এবং ৩. লাঙ্গল। বৈদিক যুগে লাঙ্গল ছিল সর্বপ্রধান কৃষির উপকরণ। লাঙ্গল কর্ষনের মাধ্যমেই উৎপাদিত অন্নের সমৃদ্ধির দ্বারা পরিবার, কন্যা গায়, বলদ, অশ্ব ইত্যাদি গৃহপালিত পশুদের পুষ্টি প্রদান করা হয়-

"लागलं पवीरवत् सुशीमं सोमत्सरा"।[3]

ফাল:- লাঙ্গলের নিচের অংশে ধারালো ভাগ, যেটা ভূমিতে প্রবেশ করে মাটি বিদীর্ণ করে তাকে ফাল বলা হয়-

"शुनं सुफाला वितुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनुयन्तु वाहान्"।[4]

বৈদিক ভাষ্যকারেরা ফাল বলতে লাঙ্গলের নিচের ভাগের যুক্ত তীক্ষ্ণ ধার যুক্ত অংশকেই বুঝিয়েছেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য অথর্ববেদে ফাল পদটির অর্থ করেছেন-

"सुफालाः शोभनानि लाङ्गलमुखानि"।

অর্থাৎ ফাল হলো লাঙ্গলের সুশোভিত মুখ বা অগ্রভাগ যা মাটির গভীরে প্রবেশ করে মাটিকে বিদীর্ণ করে।

খনিত্র:- কৃষিকার্যে লাঙ্গল ছাড়াও কর্ষণের জন্য কোদাল, বেলচা, শাবল, পাশ্নি, টাঙি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এই সব উপকরণ গুলিকে একত্রে বৈদিক সাহিত্যে খনিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি খননের জন্য ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে খনিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে-

"अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजमापत्यं वलमिच्छमानः।
उभौवर्णावृषिरूग्रः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषोजगाम्"।।[5]

---

[1] ঋগ্বেদ-১০.৩০.৪
[2] অথর্ববেদ-৬.৩০.১
[3] অথর্ববেদ-৩.১৭.৪
[4] অথর্ববেদ-৩.১৭.৫
[5] ঋগ্বেদ-১.১৭৯.৬

এছাড়াও দাত্র বা সৃণি[1] এবং শূর্প বা তিতউ[2] বা চালুনি, কুঠার, কুড়ুল, টাঙি, আয়ুধ প্রভৃতি যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সন্দর্ভ-গ্রন্থসূচী (Bibliography):

মূলগ্রন্থ:

১। অথর্ববেদ : সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প. রামস্বরূপ শর্মা গৌড়, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩।
২। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র : হরদত্ত এবং সুদর্শাচার্য টীকা সহিত, হিন্দী অনু. উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয়, চৌখম্বা সীরীজ অফীস, বারাণসী, ১৯৭১।
৩। ঋগ্বেদ : স্বামী দয়ানন্দ ভাষ্য, বৈদিক পুস্তকালয়, দয়ানন্দ আশ্রম, কেশরগঞ্জ, আজমের।
৪। : সায়ণ ভাষ্য সহিত, অনু. প. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৭।
৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ : সায়ণাচার্যকৃত বেদার্থ ভাষ্য সহিত, সম্পা. সুধাকর মালবীয়, প্রাচ্য ভারতীয় গ্রন্থমালা-১৪, বারাণসী, ১৯৯০।
৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ : সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প্রো. পুষ্পেন্দ্র কুমার, নাগ প্রকাশন, দিল্লী, ১৯৯৮।
৭। যজুর্বেদ : স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভাষ্য, শ্রদ্ধানন্দ অনুসন্ধান প্রকাশন কেন্দ্র, গুরুকুল কাঁগড়ী বিশ্ববিদ্যালয়, হরিদ্বার, ২০০৯।
৮। বাজসনেয়ী সংহিতা : মাধ্যন্দিন শাখা, হিন্দী অনু. ডা রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ১৯৬২।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। গুপ্তা, দেবেন্দ্রকুমার, বৈদিক কৃষি বিজ্ঞান, প্রতিভা প্রকাশন, দিল্লী, ২০১২
২। দ্বিবেদী, কপিলদেব, অর্থববেদ কা সাংস্কৃতিক অধ্যয়ণ, বিশ্বভারতী অনুসন্ধান পরিষদ, জ্ঞানপুর(বারাণসী), ১৯৮৮
৩। শর্মা, নীরজ, সংস্কৃত কৃষি শাস্ত্র, লিট্রেরী সর্কিল, জয়পুর, ২০১৩

[1] অথর্ববেদ-১০.৯.২৪
[2] অথর্ববেদ-৯.৬.১৬